

# শিক্ষায় বিনিয়োগ ও ঋণ

শিক্ষা ঋণ

ফারুক মঈনউদ্দীন

শিক্ষাঋণ, উচ্চশিক্ষাঋণ কিংবা শিক্ষার্থীঋণ—যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, এটির মূল উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের আয় থেকে পরিশোধ করার শর্তে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যয়ভারের একাংশ সরকার বা বিশেষায়িত কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের সহজতম উপায় বলে গণ্য করা হয়। কারণ, আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের যে বিকল্প পস্থা ব্যবসা, সেটি শুরু করা বা চালু রাখার মতো অর্থনৈতিক সক্ষমতা খুব কম ক্ষেত্রেই তারা অর্জন করতে পারে। উপযুক্ত কর্মসংস্থানের একমাত্র চাবিকাঠি হচ্ছে উচ্চশিক্ষা। কিন্তু এই সব পরিবারের অন্যান্য মৌলিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানের উচ্চশিক্ষার খরচ জোগানো তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এসব পরিবারের বহু প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার ব্যয় নির্বাহের অক্ষমতায় হারিয়ে গেছেন। আমাদের দেশে মুষ্টিমেয় কিছু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের জীবনী থেকে জানা যায়, আচমকা কোনো সফল পৃষ্ঠপোষক না পেলে কখনোই ওপরে উঠে আসতে পারতেন না তারা। এই শ্রেণিভুক্ত নন এমন অনেক প্রতিভা লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে অপচয়িত হয়েছেন আমাদের অপ্রতুল রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার কারণে।

শিক্ষাঋণ যে কেবল অসচ্ছল পরিবারের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজন তা নয়, সরকারি ব্যয়ের ওপর চাপ কমানোর জন্য অনেক দেশে (ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে) উচ্চশিক্ষার ব্যয় নির্বাহে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্যও শিক্ষাঋণের বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা ও পাঠদানের মানোন্নয়নের জন্য জায় বরাদ্দ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষায় সরকারি ব্যয় কমানোর প্রয়াসের একটা উপায় হিসেবেও শিক্ষাঋণ উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। সরকারি অনুদান, বৃত্তি কিংবা বিনা মূল্যে শিক্ষা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে শিক্ষার ব্যয়কে আরও সুসমভাবে বন্টন করে নেওয়া এবং সর্বোপরি মানসম্পন্ন সর্বজনীন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করাও শিক্ষাঋণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এতৎসত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষাঋণের কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তার কয়েকটা সম্ভাব্য কারণ: ১. স্বল্পোন্নত দেশে শিক্ষাব্যয় তুলনামূলকভাবে কম। ২. কিছু কিছু দেশের সাধারণ মানসিকতায় স্বাবলম্বী করে না তোলা পর্যন্ত অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষাব্যয় নির্বাহ করাকে প্রধানতম কর্তব্য বলে মনে করেন। তাই তারা কন্যাসন্তানের বিয়ের খরচের সংস্থান রাখার মতো সন্তানের শিক্ষার জন্যও সঙ্কল্প করেন। এমনকি অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ করেও তাঁরা সন্তানের শিক্ষাব্যয় নির্বাহ করার চেষ্টা করেন। ৩. উন্নয়নশীল দেশে সরকার কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাঋণের কোনো ব্যবস্থা না থাকার কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো শিক্ষাঋণ নামে কিছু সেবা চালু করেছে বটে,



কিন্তু সেগুলোর কঠিন শর্ত ও বাণিজ্যিক সুদের হার শিক্ষাঋণের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় বলে সেই সব ঋণের কোনো গ্রহীতা খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. কিছু পশ্চাৎপদ সমাজে ঋণ গ্রহণ করে সন্তানের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করাকে অমর্যাদাপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়। ৫. অনুন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও অনগ্রসর অর্থনীতিতে একজন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত কর্মজীবীর সম্ভাব্য আয় শিক্ষাঋণ পরিশোধের জন্য অপর্যাপ্ত বলে ব্যাংকগুলো এ ধরনের ঋণের বিষয়ে অনাগ্রহী।

বাংলাদেশে শিক্ষাঋণ কার্যকরভাবে চালু না হলেও ১৯৮০-র দশকে সোনালী ব্যাংকের তদানীন্তন প্রধান নির্বাহী লুৎফর রহমান সরকার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার শেষে তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চালু করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসংস্থান প্রকল্প, 'বিকল্প'। কোনো জামানত ছাড়া কেবল শিক্ষা সনদ জমা রেখে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার যুগান্তকারী এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ৩৮টি খাতে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কেবল উচ্চশিক্ষিত তরুণদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিই এটির উদ্দেশ্য ছিল না, কর্মজীবনে প্রবেশ করা তরুণদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাও ছিল এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আজ থেকে ৩৩ বছর আগে চালু হওয়া প্রকল্পটি একসময় বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এই প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৩০০ সফল উদ্যোগের মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, এই প্রতিশ্রুতিশীল তরুণেরা আজ প্রতিষ্ঠিত সফল উদ্যোক্তা। প্রকল্পটি বন্ধ হওয়ার পেছনে বহু কারণ দেখানো যেতে পারে, কিন্তু যেসব কারণে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়, সেই দুর্বলতাগুলোর সমাধান বর্তমান সময়ের নিবিড় নিয়ন্ত্রণ এবং পরিপালন সংস্কৃতিতে বহুলাংশে নিশ্চিত করা যেত।

শিক্ষাজীবন শেষ করার পর এরকম একটি অভিনব কর্মসংস্থান প্রকল্প যদি থাকতে পারে, তেমনিভাবে শিক্ষাগ্রহণ পর্বেও এ-জাতীয় উদ্ভাবনী কিছু যে করা যায় না, তা নয়। তার

জন্য প্রয়োজন সদিচ্ছা এবং উপযুক্ত রূপকার। প্রতিবছর আমাদের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছান লক্ষাধিক শিক্ষার্থী। ২০১৬ সালে ১২ লাখ এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৮ হাজার। আমাদের দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই মোট আসনসংখ্যা ৪৫ হাজার। আর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের হিসাবে ২০১২ সালে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ২৫ হাজার, পরবর্তী বছরগুলোতে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। অন্য হিসাবে দেখা যায়, ২০১৬ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গেছেন ৪৫ থেকে ৫১ হাজার শিক্ষার্থী।

ওপরের উপাত্তগুলো থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে এই বিশালসংখ্যক উচ্চশিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষাঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক এবং যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যাও হবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আর্থিক খাতে নানা নামে বিভিন্ন সেবাপণ্য সংযোজন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং, স্কুল ব্যাংকিং ইত্যাদি চালু করা হলেও শিক্ষাঋণ খাতে ব্যাংকগুলোর অংশগ্রহণ প্রায় অনুপস্থিত। বর্তমানে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বেসরকারি খাতের ব্যাংকে নামমাত্র শিক্ষাঋণ নামের প্রকল্প চালু থাকলেও সেগুলোর সুদের হার ক্ষেত্রবিশেষে বাণিজ্যিক ঋণের সুদের চেয়ে বেশি এবং কঠোর শর্তাধীন বলে এই ঋণ সেবাপণ্যগুলো নামসর্বস্ব হয়ে টিকে আছে। ফলে এই ঋণের বকেয়া স্থিতি প্রায় সব ব্যাংকেই শূন্য। যেখানে ব্যবসায়ী ঋণের সুদের হার এক অঙ্কের ঘরে নেমে এসেছে, সেখানে শিক্ষাঋণের সুদের হার ১২ থেকে ১৬ শতাংশ রাখার দুটি যুক্তি থাকতে পারে। প্রথমত, ব্যাংকগুলো এই খাতে কোনো ঋণ দিতে চায় না, তাই সুদের এই উচ্চহার, কিংবা এই ঋণ জামানতবিহীন বলে এই খাতে খেলাপির হার এবং আদায়ের খরচও বেশি।

আমাদের বাস্তবতায় কার্যকর শিক্ষাঋণের অনুপস্থিতির কারণগুলো এ-রকম হতে পারে:

১. আমাদের অধিকাংশ ঋণ অভিভাবক কর্তৃক নেওয়া হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবক এই ঋণের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নন। ২. শিক্ষার্থীরা অভিভাবকের জামানত বা তাঁদের আয়ের পরিবর্তে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আয়ের বিবেচনায় ঋণ গ্রহণে আগ্রহী, কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতায় শিক্ষাজীবন শেষে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তার কারণে ব্যাংকগুলো এই ঋণ নিতে অনিচ্ছুক। উল্লেখ্য, বছরে ২০ লাখ যুবক কর্মবাজারে প্রবেশ করেন, যাদের কর্মোপযুক্ত সংস্থানের নিশ্চয়তা নেই। ৩. বিদেশে পড়াশোনার জন্য শিক্ষাঋণের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি হলেও এ ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো শিক্ষার জন্য ঋণ দিতে আগ্রহী নয়। কারণ, বিদেশে পড়াশোনা শেষে শিক্ষার্থীর দেশে ফেরা অনিশ্চিত। আবার শিক্ষার্থীদের যে পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন হয়, ব্যাংকগুলোর বর্তমানে চালু স্কিমগুলোর সর্বোচ্চ ঋণসীমা সে তুলনায় নগণ্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেবল সচ্ছল পরিবারের সন্তানরাই বিদেশে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পান, যাদের ঋণের প্রয়োজন পড়ে না। ৪. শিক্ষাঋণের চেয়ে ব্যাংকগুলোর অন্যান্য ভোক্তাঋণ অনেক বেশি সহজলভ্য, যদিও সেসবের সুদের হার অত্যধিক, যা শিক্ষাঋণের জন্য উপযুক্ত নয়।

এসব কারণে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য ঋণের প্রয়োজন থাকলেও চালু করা হয়নি, নামমাত্র চালু করলেও সেগুলো ব্যবহার করা যায়নি। অথচ এ কথা কে অস্বীকার করতে পারবে যে শিক্ষার ব্যয় একটা জাতির উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ? অপর্যাপ্ত শিক্ষার কারণে উর্ধ্বমুখী হয় অপরাধ প্রবণতা, নিম্নমুখী হয় স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। আর এসব নিরাময়ে বাড়ি সরকারি ব্যয়। গবেষকদের মতে, প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগের সফল সবচেয়ে বেশি। কারণ, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় কম অথচ এটি দিয়েই দৃঢ় হয় মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার ভিত। সরকারি বিনিয়োগের এই অগ্রাধিকারটি স্বীকৃত হলে উচ্চশিক্ষায় আনতে হবে বেসরকারি অংশীদারত্ব, তার একটি হবে শিক্ষাঋণের কার্যকর ব্যবস্থা। আমাদের ব্যাংকিং খাতের বর্তমানের নামসর্বস্ব শিক্ষাঋণ প্রকল্পগুলোকে নতুনভাবে গঠন করতে হবে, যাতে এটি সহজলভ্য হয়। কেবল বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে শিক্ষাঋণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলে এই উদ্দেশ্য সফল হবে না। ব্যাংকিং খাতকে সঙ্গে নিয়ে তৈরি করতে হবে আলাদা প্রতিষ্ঠান, যাতে যোগ্যতা, অর্থায়ন, ভর্ত্তিকি, জামানত, আদায়—সব বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। সাধারণ উচ্চশিক্ষার চেয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ঋণের কার্যকারিতা বেশি বলে এটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষাঋণের বড় অন্তরায় কর্মসংস্থানের সমস্যাটি দূর করা যাবে এবং বাড়বে কারিগরিভাবে দক্ষ কর্মশক্তির হার, বন্ধ হবে সার্টিফিকেটধারী উচ্চশিক্ষিত বেকার তৈরির প্রবণতা। তবে প্রথমে একটি বিষয়ে সবার উপলব্ধি জাগ্রত হতে হবে যে জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষাব্যয় একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ। তার জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে উচ্চশিক্ষায় যুক্ত করতে হবে বেসরকারি বিনিয়োগ। এটি নিশ্চিত করা যাবে কেবল একটা কার্যকর ও সাত্রায়ী শিক্ষাঋণের ব্যবস্থার মাধ্যমে, যার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবক, ব্যাংক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন দাতা প্রতিষ্ঠান।

ফারুক মঈনউদ্দীন : লেখক ও ব্যাংকার।  
fmainuddin@hotmail.com